হার্বার্ট মার্কুসে

নেতিবাদী চিন্তা : প্রতিবাদের প্রচলিত ও পরাজিত যুক্তি

"যা চলছে তা সত্য হতে পারে না।" আমাদের অভিজ্ঞ শ্রবণেন্দ্রীয়ে বাক্যটি ধৃষ্টতাপূর্ণ হাস্যকর অতিকথন মনে হয় ঠিক যতটা বাহুল্যপূর্ণ মনে হয় এই বাক্যটি ঃ "যা কিছু বাস্তব তাই যৌক্তিক।" সংক্ষেপে এই হল পশ্চিমদুনিয়ায় যুক্তিবাদের ধারণা যা প্রচলিত তর্কবিদ্যারই অঙ্গ স্বরূপ। দুটি ক্ষেত্রেই বাস্তবের বিরোধমূলক চরিত্রটি স্পষ্ট। যে প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত অভিজ্ঞতার জগতে আমরা বাস করছি, প্রয়োজন তার সঠিক অনুধাবন।

যুক্তি = সত্য = বাস্তব—এই সমীকরণে বিষয়িতা এবং বিষয়তা যে সক্রিয় বিরোধের জন্ম দেয় সেখানে যুক্তি-ই হল সেই অমোঘ অন্তর্ঘাতমূলক শক্তি যা সত্যকে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

যুক্তির তাত্ত্বিক এবং ফলিত বাস্তবটি যে একান্তভাবেই বিষয়তায় আবদ্ধ বা বিষয়ী নয় তা প্রমাণ করাই পশ্চিমী তার্কিকদের মূল লক্ষ্য ছিল।

নিয়ন্ত্রণবাদী প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা এই যুক্তিবাদের নবতম অবতার। উন্নততর শিল্পোন্নত সভ্যতার ঐতিহাসিকভাবে পূর্বপরিকল্পিত এই প্রকল্পের মধ্যে এক ভয়াল সমন্বয় বিদ্যমান, সেখানে অত্যাচার এবং স্বাধীনতা কিংবা উৎপাদন এবং ধ্বংস—পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। কিন্তু উন্নতির অন্তরালে প্রাতিষ্ঠানিক এবং নাশকতামূলক চিন্তা পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত। এই সংঘাতের বিনাশ সাধনের লক্ষ্যই ভোগবাদ উঠে পড়ে লেগেছে। চূড়ান্তভাবে একরৈখিক বা একমাত্রিক চিন্তার যথেচ্ছ প্রসার এবং প্রচার করতে।

চিন্তার এই দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। সেই প্লেটোর দ্বান্দ্বিকতামূলক অধিবিদ্যক দর্শন এবং অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এর সূত্রপাত। ধ্রুপদি গ্রীক দর্শনে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যের কষ্টিপাথরে নির্ভেজাল সত্যকে যাচাই করে নেওয়া হত এবং এই সত্যই সত্তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বলে ধরা হত। এর ভিত্তিতেই সমস্ত দার্শনিক বিবৃতিগুলো প্রস্তুত করা হত। যা আমরা সাদা-চোখে দেখতে পাই (বাস্তবরূপে)।

তা-ই যে সত্য নয় অর্থাৎ সত্য আর বাস্তব যে আলাদা—এই ব্যাপারটাই পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়, অর্থাৎ সত্য হল নৈতিকতা এবং সত্তা সত্তাহীনতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। 'সত্তাহীনতা' বলতে অস্তিত্বহীনতা বোঝায় না, বোঝায় ধ্বংসালোলুপতা, ধর্ষকাম মানসিকতা। সত্যের প্রতিষ্ঠা এই সত্তাহীনতার বিনাশের মাধ্যমে। সক্রেটিস এথেনিয়ান নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এভাবেই লড়াই করতে চেয়েছিলেন।

অর্থাৎ তাঁর প্রকল্পটি ছিল পুরোমাত্রায় মানবিক।

সুতরাং জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) এবং নীতিশাস্ত্র পরস্পর সমার্থক।

সুতরাং জাগতিক যা-কিছু তা প্রতিনিয়ত ধ্বংসের করাল গ্রাসে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় কালো ছায়ায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু এই মহাজাগতিক বিশ্বের নেতীবাচক চিন্তাই একে স্বযত্নে লালন করে চলেছে। সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়েছে। দর্শনের শুরুই হয়েছে একটা বিরাট শূন্যস্থান থেকে সেটা সর্বদা দ্বিমাত্রিক। অর্থাৎ দৃশ্যমানতা ও প্রকৃত বাস্তব, মিথ্যা ও সত্য, পরাধীনতা ও স্বাধীনতা—এই বৈপরীত্যগুলি সত্তাতত্ত্ববিজ্ঞানেরই গবেষণার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ এই দ্বিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট বিরোধগুলো বিমূর্ত চিন্তার কোনো ত্রুটি বা গুণ নয়, বরং প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই দ্বৈত সত্তা বর্তমান। জীব এবং জড় এখানে "নিজেদের দ্বারা" এবং "নিজেদের মত" কারণ তারা প্রকৃতিগত অন্য সত্ত্বগুলি বর্জন করেছে অথবা তাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। দর্শন দ্বন্দ্বতাত্ত্বিকতার ঠিক এই বিশেষ বহুকেন্দ্রীক দিকগুলোর ওপরই আলোকপাত করে।

কিন্তু এই খাঁটি নির্ভেজাল সত্য যার দ্বারা ইচ্ছা শক্তি-চালিত একটি সত্তা গড়ে ওঠে, তাতে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিটি ঠিক কি হতে পারে? ধ্রুপদি গ্রীক দর্শনে স্বজ্ঞা (intuition)-কে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বজ্ঞা দেকার্ত-প্রদর্শিত পথেই নিরূপিত হয়ে এসেছে। স্বজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে এক বৌদ্ধিক ধ্যানমগ্নতা। (প্রপঞ্চাবিজ্ঞানে [Phenomenology] তাই স্বজ্ঞার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।)

উদাহরণস্বরূপ আমরা মানবচরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে যদি আলোকপাত করি তাহলে দেখা যাবে মানুষের কিছু প্রবৃত্তিগত ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে "সুন্দর জীবন" এর সংজ্ঞা দিতে পারে। অর্থাৎ যে জীবন কষ্টবর্জিত, স্বাধীন এবং কদর্যময়তা মুক্ত। সুতরাং এই ধরনের জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে মানুষকে তার স্বজ্ঞার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই হবে।

দার্শনিকরাই এই পথ সুনিশ্চিত করতে পারেন। দর্শন এই নৈতিকতার হাত ধরেই চিরকাল পথ চলে এসেছে। এরই মধ্যে বিজ্ঞান একটা ব্যাপার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে দর্শন অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রীকরাই তো একথা মানেন যে বর্বর জাতি এবং সু-সভ্য জাতির মানুষের সংজ্ঞা এক হতে পারে না। তাই দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যখন অস্তিত্বটাই অনিশ্চয়তাপূর্ণ।

প্লেটোর শেষের দিকের ডায়ালগগুলো আর অ্যারিস্টটলের নিজস্ব বক্তব্যের একটা জায়গায় মিল আছে তা হল এই : সসীমতা থেকে চলতে শুরু করলেও মানুষ ক্রমশ জটিলতর সমস্যাগুলোর পথ নিজেই খুঁজে বের করে নেয় পর্যায়ক্রমে সত্যউদঘাটনের মাধ্যমে। দার্শনিক অনুসন্ধানের মূল কথাই হল কিভাবে নেতিবাদকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীন চিন্তা রপ্ত করা যায়।

আর এক্ষেত্রে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল চিহ্ন (logos) এবং যৌনতা (eros)। এই দুটি নেতিবাদের মহাস্ত্রস্বরূপ। প্রচলিত সত্যের মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য এই দুটি অব্যর্থ ভাবে কাজ করেছে। চিহ্ন এবং যৌনতা একই সাথে বিষয়িতা এবং বিষয়তার সূচক। কারণ নীচ থেকে উচ্চে আরোহণের জন্য মন এবং বস্তু দুটোই প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটলের মতে—এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত সত্ত্বা হিসেবে সৃষ্টিকর্তা সমস্ত 'নীচ' কে উপরে চালিত করেন (অর্থাৎ উৎকর্ষতার দিকে আকষর্ণ করেন)।

চিন্তার প্রাবাল্য কিংবা ভালবাসার উন্মত্ততা দুটোই তথাকথিত যুক্তির বাঁধ ভেঙে দেয়। এই দুর্দমনীয় সত্য বদলে দেয় চিন্তা তথা অস্তিত্বকে, যুক্তি এবং স্বাধীনতার সীমাকে।

কিন্তু কিছু কিছু অস্তিত্বগত ধারায় এই 'সত্য' প্রায় উপলব্ধই হয় না, অর্থাৎ চিত্তের আনন্দ থেকে তা বঞ্চিত। সেই সব দলিত বঞ্চিত অস্তিত্ব যেগুলি নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই অসংখ্য বিপদের এবং নির্মম কষ্টের সম্মুখীন হয় তাদের কাছে তো অস্তিত্বটাই 'মিথ্যে' এবং ভয়ানকভাবে পরাধীন। যেন মনে হয় এই ধরনের অস্তিত্বে অর্থাৎ এই বিশেষ শ্রেণীগত বৈষম্যে এটিই সত্য যে অস্তিত্ব স্বাধীনতাহীন, পরাধীন। আর এই চিন্তা প্রযুক্তি-পূর্ব সভ্যতায় ভালভাবেই মানানসই ছিল, তা বলা যায়।

কিন্তু প্রাক-প্রযুক্তিগত এবং প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার পৃথকীকরণের সূচক কখনোই এটা হতে পারে না যে প্রথমটি অস্তিত্বগতভাবে পরাধীন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুক্ত তথা স্বাধীন। এই সমাজ ব্যবস্থাই সংকীর্ণ স্বার্থে এমন পন্থা অবলম্বন করেছে যাতে কিছু বিশেষ শ্রেণীর মানুষ তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যুনতম উপকরণ সংগ্রহের উপায়ের মধ্যে ''স্বাধীনতা''বলে কিছুই খুঁজে পায়না। ধ্রুপদি মতে ''সত্য'' এবং ''প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে রুটি-রুজির সংস্থান'' পরস্পরবিরোধী একটি ধারণা এবং এটি বর্তমান ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবেই বর্তায়।

ধ্রুপদি চিন্তা অনুসারে শ্রেণীবৈষম্যের জন্যই স্বাধীন চিন্তা এবং বাক্‌স্বাধীনতা—দুটিই কিছু বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর করায়ত্ত থাকে। যেহেতু চিন্তা বাক্‌স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় আরোপিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরে থেকে বিশেষ কিছু গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মাধ্যমে, তাই প্রাক-প্রযুক্তিগত এবং প্রযুক্তি নির্ভর অস্তিত্বের পার্থক্য বোঝা যায় মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যত সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়।

''জীবিকার সন্ধানে মানুষ'' এই বিশেষ ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই মুক্তি এবং পরাধীনতা বা সত্য এবং মিথ্যার নতুন নতুন সমীকরণ তৈরি হয়।

ধ্রুপদি মতে 'আত্ম' (subject) বলতে প্রকৃতপক্ষে ঠিক কাকে বোঝায়, যে সত্য এবং অসত্যকে একেবারে 'বোধ' এর গোড়া থেকে ধরতে পারে? সে একমাত্র মানুষ যে তত্ত্বকে নিবিষ্ট রূপে অবলোকন করে এবং সেই তত্ত্বের ফলিত রূপ নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করতে পারে। একাধারে দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনায়ক। প্রচারিত সেই সত্য সমস্ত মানুষেরই বোধগম্য হওয়ার কথা। প্লেটোর মিনো (Meno) তেও এরকম বর্ণনা আছে সেখানে দার্শনিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দাসত্বের অধীনে থাকা ব্যক্তিবিশেষও জ্যামিতির রীতিনীতি বুঝতে সক্ষম হয়। এই সত্য যেন সমস্ত পরিবর্তন ও দুনীর্তির উর্দ্ধে। কিন্তু যেহেতু সত্তা এবং চিন্তনের সঙ্গে ''সত্য'' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং চিন্তনের মাধ্যমেই সত্যের পথ উন্মোচিত হওয়া সম্ভব, তাই যদি চিন্তার পথটিই রূদ্ধ হয়ে পড়ে তবে দাসত্বের মানসিকতাই তৈরি হয়, সত্যে উপনীত হওয়া যায়না এবং তা অধরাই থেকে যায়। প্রয়োজনের তাগিদ যদি সবাই সমানভাবে অনুভব করতে

বা যদি বেঁচে থাকাটা সবার পক্ষে সমানভাবে সহজ হত, তাহলেই হয়ত সত্যের বিশ্বজনীনতা রক্ষা হত। কিন্তু দর্শন এই সাম্যের পথ দেখাতে অপারগ হয়েছে।

তাই ইতিহাসের দ্বারা যেন একটি বিকৃতিই স্বীকৃত হয়েছে ঃ—কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য ছিল আছে এবং থাকবে। তাই ''সত্য'' সামাজিকভাবে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণীরই কুক্ষিগত—এবিষয়ে সন্দেহই নেই। এই হল দাসত্ব-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃত রূপ।

সুতরাং চিন্তনের শক্তিই একমাত্র ''সত্য''র অবরুদ্ধ দ্বার খুলে দিতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে যারা দিনান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে তারা অস্তিত্বটাই উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত।

তাই প্রাক-প্রযুক্তিগত যুক্তিবাদ দ্বি-মাত্রিক হলেও, প্রযুক্তিগত তর্কবিদ্যা চূড়ান্তভাবে একমাত্রিক হয়ে পড়েছে।

অ্যারিস্টটল কিছু ''নেতিবাচক পদ্ধতি''-র উল্লেখ করেছিলেন যার দ্বারা ভাষা ব্যবহারের মধ্যেই সত্য এবং অসত্যের চিহ্নায়ন লক্ষ্য করা সম্ভব। হিউসার্ল যখন ''নেতিবাচক পদ্ধতি''র পুনর্নবীকরণ করেন তখন তিনি সমালোচনামূলক প্রবণতার ওপর জোর দেন। তিনি দেখেন স্বাধীনভাবে বিচার করার ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে যেহেতু চিন্তা সবসময় সত্য-র ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারছে না।

মানুষ শুধুমাত্র একটা পটে আঁকা ছবির মত ক্রমাগত ''ভান'' করে যাচ্ছে। হিউসার্লের মতে তর্কবিদ্যার বিরাট বড় অকমর্ণ্যতা ঠিক এই জায়গাটাতেই। যেকোনো ঘটনা কখন ''সত্তা'' এবং কখন ''সত্তাহীনতা'' রূপে গণ্য হচ্ছে এবং তা কিভাবে আমাদের মধ্যে থেকে বিশেষ একটি ''বিচার'' বা ''সিদ্ধান্ত'' নিষ্কাষণ করে নিচ্ছে সেদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখা আশু প্রয়োজন। তবেই সত্তা (intuition) আত্মনির্ভর হতে পারে।

প্লেটোর ডায়ালগগুলিতেও কথোপকথনের মাধ্যমে এবং সুচিন্তিত প্রশ্নের মাধ্যমে অস্তিত্বের যে উত্তরগুলো পাওয়া যায়নি তাদের জানার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রদত্ত ব্যবস্থাতেই বিশ্বাস না করে তাকে বারংবার ভেঙে ফেলে তার পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং অন্তর্ঘাতের এবং বিনিমার্ণের প্রয়োজন আছে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য।

প্লেটো তো চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবেই বলে ওঠেন—মৃত্যুর মাধ্যমেই প্রত্যেক দার্শনিকের জন্ম হয়। স্বাধীনতা হবে প্রতিক্রিয়াশীল যা মুক্ত করবে প্রচলিত রীতিনীতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন গুহা থেকে (প্লেটোর Cave তত্ত্ব অনুসারে)। তর্কবিদ্যা অনুসারে প্রত্যেক ''হয়'' (is) কে ''উচিত'' (ought) এর আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। দ্বিমাত্রিক চিন্তা অনুসারে এই দ্বন্দ্বমূলক তর্ক দর্শনে থাকতে হবে। বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে যাকে ''সত্য'' বলে চালানো হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে অসত্য। উদাহরণস্বরূপ এইসব প্রস্তাব : ''সততাই প্রকৃত জ্ঞান'' কিংবা ''ন্যায় হল সেই ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকে নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে কাজ করতে পারে'' বা ''প্রতিটি বাস্তব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়ার উপযোগী—ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই নিজেদের খণ্ডন করে, অসত্য কিংবা অর্ধসত্য। ''মানুষ মুক্ত'' বা ''রাষ্ট্রব্যবস্থা যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত''—এইসব প্রবাদ নিতান্তই হাস্যকর, প্রত্যেক বিবৃতিই এর ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সত্তার মধ্যেই এই দ্বন্দ্ববাদের আতস কাচ দিয়ে দেখলে "হয়"(is) এবং "উচিত" (ought) এর বিরোধটা চোখে পড়তে বাধ্য। চিন্তন, মানুষের সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে কাজের নীরিখে যখন সুগঠিত হয় তখন রাজনৈতিকভাবে "সদগুণ", "ন্যায়", "দয়া", "জ্ঞান" এইসব ধারণা "ধোঁয়াশা পূর্ণ" বলে সহজেই ধরা পড়ে। এই ধরনের "নাশকতামূলক" (এবং অবশ্যই তা রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে) চিন্তাই নতুন ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু একথাটা মাথায় রাখতে হবে যে চিন্তা যেন শুধু "চিন্তার" পর্যায়েই না থাকে। অর্থাৎ চিন্তার (এই ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক) অবশ্যই কঠোরভাবে বাস্তব প্রয়োগ প্রয়োজন। তবে এই প্রয়োগ সাধারণ বস্তুবাদী প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিমূর্ততা যদি চিন্তনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তবে যে কোনো দার্শনিক চিন্তা যা সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম তাকে নেতিবাদী বা দ্বন্দ্ববাদের মাধ্যমেই ভাবতে হবে।

এই বিমূর্ততা অবশ্যই প্রচলিত ধারণা থেকে বা নেতি-বুর্জোয়া ধারণা থেকে পৃথক। যদিও নেতিবাদের মাধ্যমে বিমূর্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তবু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেই বিমূর্ততা যেন প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি না করে গঠিত হয়। তাহলে কিন্তু পুরো প্রকল্পটাই ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ নতুন চিন্তনের বা অবস্থানের সূচনামূলেই বিনষ্ট হবে।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রেও বৌদ্ধিক আর কায়িক পরিশ্রমকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। বৌদ্ধিক এবং কায়িক শ্রমের এই পৃথকীকরণ প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব এবং প্রয়োগের পার্থক্যের বিরাট বাস্তবটার নেপথ্যে আছে। অ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা তৈরী হয়। সেইসব মানুষ যাদের অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তনটা সব থেকে দরকার, তারাই দর্শনের তাত্ত্বিক প্রয়োগের আওতায় অনেক বাইরে থেকে গিয়েছে। চিন্তন এক্ষেত্রে চূড়ান্ত মূঢ়তার পরিচয় দেয়। শুধুমাত্র বস্তুবাদ "ধর্মদ্রোহী" (heretics)-রা অস্তিত্বের আঁচে দর্শনকে ঝলসাতে চেয়েছিলেন।

কঠোরভাবে সংশয় বা সমালোচনার পথ ধরেই "ভাববাদ" কে খণ্ডন করা যায়। চিন্তা থেকে জীবন নয়, বরং জীবনের প্রবল যন্ত্রণাময় পাঠবৃত্তান্ত থেকেই দর্শন প্রস্তুত করা উচিত। যে কোনো দার্শনিক প্রস্তাবনা যদি চিন্তন ও অস্তিত্বের দ্বিমাত্রিক দ্বন্দ্বমূলক সাহচর্য না মানে তাহলে চিন্তনের একটা শুষ্ক সাধারণ কাঠামো উঠে আসে যেটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে। মুষ্টিমেয় কতিপয় শ্রেণীর "বিশ্বজনীনতায়" ন্যস্ত হয়।

এ ধরনের গঠনগতভাবে একরৈখিক বিষয়িতা পরিবর্তন /স্থবিরতা, সম্ভাবনা/প্রকৃত বাস্তব, সত্য/অসত্যের মত অস্তিত্বের গূঢ় চিন্তাগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। প্লেটোর ডায়ালগগুলি অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতা এবং অ্যারিস্টটলের গঠনতান্ত্রিক তর্কনীতির মধ্যে এই জায়গাটাকে কেন্দ্র করেই মূল বিরোধ গড়ে উঠেছে।

অ্যারিস্টটলের অবরোহী পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত পরিভাষা শব্দটির কোনো স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় না। সেখানে প্লেটোর অধিবিদ্যামূলক পরিভাষাগুলি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অস্তিত্বগত সত্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সাহায্য করে। আর্নস্ট কাপ্ আরেক দার্শনিক প্রন্টিল এর বিরোধিতা করে একথা তো বলেইছেন "অ্যারিস্টটল দুটি ভিন্ন মত কে কখনোই পরস্পরবিরোধীতার জায়গায় নিয়ে আসতেন না।"

অ্যারিস্টটলের গঠনতান্ত্রিক তর্কবিদ্যায় চিন্তন সমস্ত বস্তুগত, সামাজিক বা প্রাকৃতিক বিষয়গুলি থেকে একটা গুরুত্ব বজায় রাখে। একটা সরলীকৃত সাধারণ (সর্ব্বজনগ্রাহ্য) নিয়মানুসারে সমস্ত যুক্তিগুলি সাজায়, বিশ্লেষণ করে এবং উপসংহারে পৌঁছায়। এইখানে 'পরস্পরবিরোধী' কোনো যুক্তি কাজ করে না, বরং বস্তুগত 'সারবত্ত্বা'-র উর্ধ্বে উঠে যে কোনো দুই বা দুই এর বেশী বস্তু পরস্পরের স্থান পূরণকারী বা সমধর্মীসম্পন্ন (commensurable) বলে গণ্য হয়। ম্যাক্স জকহাইমার এবং থিওডোর অ্যাডোর্নোর মতে—

"এই সর্বজনবিদিত ধারণা বা তর্কবিদ্যার মূল ভিত্তি, তর্কবিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নিজের প্রভুত্বকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে অন্য বিপরীতধর্মী ধারণার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।"

অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যা ধারণা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটা যোগসূত্রের নির্দেশ দেয়. "প্রাথমিক কার্য-কারণ সম্পর্কে জ্ঞানই সর্বজনীন। সেই জ্ঞানই প্রকৃত এবং অবিসংবাদী তথা অর্ধসত্য। বাকী সমস্ত কার্য-কারণ সম্পর্ক হল "উদ্ভুত"। এবং তা প্রথমটিরই অনুগত। নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ এই একটি মাত্র মৌলিক জ্ঞান থেকেই সম্ভব। বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধীতার এক্ষেত্রে কোনো জায়গা নেই। নেই কোনো নেতিবাচক চিন্তন।

এই ধরনের গঠনতান্ত্রিক একরৈখিক তর্কবিদ্যায় প্রকৃত সত্ত্বা এবং দৃশ্যমানতার অবশ্যম্ভাবী বিরোধ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও তা মূলত বিলীন হয়ে যায় নিরপেক্ষতার অন্তরালে। সত্তার পরিচিতি থেকে "স্ব-বিরোধ" ফন্দিটি এবং "গূঢ়তর কার্য-কারণ" সম্পর্কগুলি যেগুলি ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় অর্থাৎ তার চেতনার পরিসরবৃদ্ধির ফলে সৃষ্টি হয়— সেগুলিকে এক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। "ধারণা" তাই নিয়ন্ত্রণের খণ্ডে পরিণত হয়। আর বর্তমান ভোগবাদের ক্ষেত্রে এই গঠনগত সর্বজনীন যুক্তি-প্রণালী আরো সুস্থিরভাবে গাণিতিক উপায়ে এবং আরো বেশী বিমূর্তকরণের মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতিয়ার। প্রযুক্তি আসার বেশ আগে থেকেই এই পদ্ধতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। যা কিছু স্বতন্ত্র্য তার ওপর নেমে এসেছে আঘাত, ক্রমশ তার বিরোধের জায়গাগুলোকে ঘষে-মেজে মসৃণ করে দিয়েছে বিজারণের মাধ্যমে।

প্রাক-প্রযুক্তিগত এবং প্রযুক্তিনির্ভর নিয়ন্ত্রণের সূত্রগুলি পরস্পরের থেকে একটু আলাদা। যেমন: দাসত্ব থেকে মজুরির ভিত্তিতে কায়িকশ্রম, অপধর্ম থেকে খ্রীষ্টধর্ম, নগরকেন্দ্রিক থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অধিকৃত দেশের জনসাধারণের হত্যা থেকে নাৎসীবাদীদের দ্বারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের হত্যালীলা। কিন্তু ইতিহাস রয়ে গেছে নিয়ন্ত্রণবাদের এবং প্রভুত্বের ইতিহাস হিসেবেই এক চিন্তন জনপ্রিয়তা পেয়ে এসেছে নিপীড়নের প্রাক-প্রয়োগগত কৌশলরূপেই।

চিন্তন প্রকৃতপক্ষে স্বাতন্ত্র্যবোধকে ছাড়িয়ে যায়। তা অতি স্বতন্ত্র (super individual) হয়ে ওঠে। সর্বজননীতা তাই চিন্তনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোনো ব্যক্তি শুধুই নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্য যে এর মানে এই নয় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে চিন্তন গঠিত হয়। দ্বন্দ্ববাদের প্রবেশ ঠিক এখানেই। থিওডোর অ্যাডোর্নো তো

বলেইছেন যে চিন্তন ব্যক্তি এবং অস্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিমাত্রিক। অথচ ধনতান্ত্রিক ভোগবাদী শিল্পোন্নত সমাজব্যবস্থা এই ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করতে চায়।

এই গাণিতিক ও প্রতীকী তর্কবিদ্যা ধ্রুপদি ঘরানা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে ''নেতিবাদের'' কোনো স্থান নেই। প্রকৃত বাস্তব যা সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রাধান্য সুনিশ্চিত করে এবং যা হওয়া উচিত অর্থাৎ ভোগবাদের ক্ষমতার বিনাশ—এই দুই এর মধ্যে দ্বন্দ্বকে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনগণের মনশ্চক্ষুর আড়ালেই রাখার সু-বন্দোবস্ত করা হয়। নবতম বৈজ্ঞানিক সত্য কখনো সুগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করে না। বরং যা করে তা হল পৃষ্ঠপোষকতা।

ঠিক এর উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে হেগেলীয় দর্শনের অনুসারী নেতিবাদী চিন্তা অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিমূর্ততাকে বর্জন করে। প্রকৃত বাস্তব এবং ব্যক্তির সম্পর্ক সরাসরি তুলে ধরে। হেগেল এই ''বিষয়গত আতঙ্ক'' প্রত্যেক সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেই লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর ফেনোমেনেলজি আপাত ''তার্কিক এবং খাঁটি যুক্তিবাদ এর মধ্যে পার্থক্যটি খুঁজে পাবার চাবিকাঠি তুলে দেয় আমাদের হাতে। দ্বন্দ্ববাদী যুক্তি কখনই নির্দিষ্ট গঠনতান্ত্রিক ছক মেনে চলে না। এই যুক্তিবাদ সংঘর্ষ সংঘাত এবং যুক্তিগত দ্বন্দ্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবকে বুঝতে এবং প্রকৃত বাস্তবের চিত্রটা জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই নেতিবাদ একান্তভাবেই আজকে প্রয়োজন। এই নেতিবাদী দ্বন্দ্ব বস্তু বা ব্যক্তি যা নয় সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটির রঙকে আলাদা-আলাদা ভাবে যুক্তির প্রিজমে প্রতিসরণ ঘটায়। প্রতিটি ঘটনার পেছনের পটভূমি এবং ইন্ধন পর্দার এপারে নিয়ে আসে। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সত্যের তাঁবেদারী নয়, সত্যকে খনন করে গূঢ়সত্য খুঁজে বের করাই এর উদ্দেশ্য এই দ্বন্দ্ববাদী চিন্তন—চিন্তনের গোড়ার সন্ধানী। বস্তু এবং বোধের রসায়ন।

কিন্তু ইতিহাস যেহেতু প্রভুত্বের প্রতিভূরাই রচনা করে থাকেন তাই সুচিন্তিত কিছু নীতির মাধ্যমে দ্বন্দ্ববাদকে নিরস্ত্র করতে নকল ইতিহাসবোধ সঞ্চালন করা হয় চিন্তনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ''অর্ন্তনিহিত নেতী'' (প্রত্যেক সত্তার অন্তরে) ধামাচাপা দেওয়ার প্রবল অপচেষ্টা কার্যকর থাকে। যুক্তিকে 'ইতিহাস'' দিয়ে রঞ্জিত করা হয়। মানবসত্তার অস্তিত্বকে ''অযৌক্তিক'' অ্যাখ্যা দিয়ে সমস্ত ''অজ্ঞতা'', ''ধ্বংসকামী মনোভাব'', ''পাশবিকতা'' এবং ''দমন পীড়ন'' দূর করার যাদু মন্ত্র দেওয়া হয় এই নয়া যুক্তিবাদের মাধ্যমে। চেষ্টা করা হয় উৎসকে অগ্রাহ্য করে ''ঐতিহাসিক সত্য''-র প্রাণ প্রতিষ্ঠার।

এই ঐতিহাসিক সত্য দিয়ে ''গঠন'' করা হয় কৃত্রিম দ্বন্দ্ববাদ, যাকে দাবি করা হয় দ্বিমাত্রিক বলে। যা ''হওয়া উচিত'' তা ''হওয়া উচিত নয়' বলে প্রতিপন্ন করার ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা চলে, সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলি ভ্রান্ত এবং বিপজ্জনক বলে গণ্য হয়। শ্রমিক প্রথমে মালিককে উচ্ছেদ করে এবং পরে প্রবল উৎসাহে (অবশ্যই মগজধোলাই এর ফলে) সেই মালিকের সমর্থনে মিছিল করে। মালিকরা আবার শ্রমিকদের ''উন্নতি'' ঘটান তাদের আরো ভালোভাবে শোষণ করার জন্য।

কিন্তু প্রকৃত তর্কবিদ্যা বিরোধকেই চিন্তনের ক্ষেত্রে "সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়" ভিত্তি বলে মনে করে। বিরোধ তো বিষয়তাই মূল্যহীন। এখানে যৌক্তিকতার সীমানা যুক্তির বিরোধিতায় এসে মেলে। ঠিক এই কারণেই যেকোনো "সুস্থিত" বাস্তব রণংদেহী মূর্তিতে এই নেতীবাদ বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়। কিন্তু প্রদত্ত বাস্তবের নিজস্ব যুক্তি অবশ্যই অন্তর্নিহিত নেতীবাদের চোরাস্রোতে জীবিত থাকে। কৌশলগত বালখিল্যপনা থেকে অনেক গভীরে এই চিন্তন। এই অন্তর্ভেদী এবং অন্তর্ঘাতী চিন্তন পদে পদে যুক্তির পরিমাণ-নির্ভরতা এবং গাণিতিক সুনির্দিষ্টতার মূলে কুঠারাঘাত করে। প্রতিবাদ করে। দৃষ্টবাদ এবং অভিজ্ঞবাদের চূড়ান্ত মূঢ়তার। তাই বর্তমান শিল্পোন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার এই নেতীবাদকে বড়ো ভয়। সর্বশক্তিদিয়ে একে বর্তমানের নীতি-নির্ধারকরা "অতীতের নিদর্শন" বলে পেছনের সারিতে ঠেলে দিতে তৎপর।

অনুবাদ : অভীক চট্টোপাধ্যায়